গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৫ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা | ৭ - ১৩ জুলাই ২০২৩ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক
সর্বহারার মহান নেতা
কমরেড শিবদাস ঘোষ

জন্মশতবর্ষ পালন করুন

মহান নেতার শিক্ষা থেকে

"... এই বিপ্লবের কথাটা বুঝবার জন্য আমরা নানা দিক থেকে পড়াশুনা করি, জানবার চেষ্টা করি কিন্তু মূল কথাটা একটাই। এই বোঝার স্তরটা যত আমরা উন্নত করি, তত তা প্রোজ্জ্বল হয়, তত জিনিসটা পরিষ্কার হয়, তত আমরা দৃঢ়চেতা হই, তত আমরা মানসিক দিক থেকে অনেক সম্পদের অধিকারী হই, বিপ্লবের উপযোগী করে দেহ-মনকে

দুয়ের পাতায় দেখুন

মানুষের জীবনের দাবি নেই স্লোগান তো শুধু পাইয়ে দেওয়ার

পঞ্চায়েত নির্বাচন

মুখ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছেন, পঞ্চায়েতে তাঁর দলকে না জেতালে যে সব সুবিধা তাঁরা দিচ্ছেন সব বন্ধ হয়ে যাবে। তিনি জনগণের যা কিছু অভিযোগ সব তাঁকে জানাতে বলেছেন। তাহলেই নাকি সমাধান হবে। মনে রাখা দরকার, তাঁর বক্তব্যের প্রসঙ্গটা ছিল পঞ্চায়েত নির্বাচন। যে পঞ্চায়েতের উদ্দেশ্য নাকি গ্রামীণ মানুষের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া বা তথাকথিত ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ।

তা হলে যে প্রশ্নটা উঠবেই, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণকে যদি ক্ষমতাবান করাটাই উদ্দেশ্য হয়, তা হলে সব সমস্যা মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে হবে কেন? গ্রামের মানুষ নিজেদের কথা বলার কোনও প্ল্যাটফর্ম পাবে না কেন? কেন কাটমানি খাওয়া নেতাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্যও গ্রামীণ জনগণকে শাসকদলের সুপ্রিমোর ওপর নির্ভর করে থাকতে হবে? তাদের ভোটে জিতে পঞ্চায়েত-বাবু হওয়া প্রতিনিধি চুরি করলে তাকে বাতিল করবার অধিকার কেন জনগণের হাতে থাকবে না? আইনের ভাষায় যাকে 'রাইট টু রিকল' বলে, জনগণকে সেই অধিকার দেওয়ার দাবি এস ইউ সি আই (সি) বহু বছর আগে থেকে তুললেও অন্য দলগুলো, তৃণমূলের কথা বাদ দিলেও যে বিরোধীরা দুর্নীতি নিয়ে উচ্চকণ্ঠ, তারাও কেন তা মানতে রাজি নয়? গ্রামের মানুষ খুব ভাল করে জানেন, পঞ্চায়েত যার বিকেন্দ্রীকরণ করেছে, যেটাকে একেবারে গ্রাম স্তরে ছড়িয়ে দিয়েছে তা হল— দুর্নীতি করার, মানুষকে মুঠোয় রাখার ক্ষমতা। কেন্দ্রের বড়-গদিতে যারা বসে তারা লক্ষ কোটি টাকার রাফাল কেলেঙ্কারি করে, নীরব মোদি, মেহুল চোকসি, বিজয় মাল্যদের দেশ ছেড়ে পালাতে সাহায্য করে। রাজ্যের মেজো-গদিতে সমাসীনরা স্কুলের চাকরি বেচে শত কোটি টাকার দুর্নীতি করে। সেই সময় পঞ্চায়েতের ছোট-গদির বাবুরা এক-দুই কোটি টাকার প্রকল্পে কাটমানি খায়, আবাস যোজনা কিংবা ১০০ দিনের কাজের টাকা মারে। স্তরে স্তরে আয়তনের পার্থক্য নিয়ে দুর্নীতির বিকেন্দ্রীকরণই হয়েছে এই দেশের প্রচলিত ভোট-ব্যবস্থায়,

দুয়ের পাতায় দেখুন

মণিপুরে শান্তি ফেরানোর দাবিতে বিক্ষোভ

মণিপুরে ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষে বিজেপি সরকারের ষড়যন্ত্রমূলক ভূমিকার বিরুদ্ধে ২০ জুন দেশজোড়া প্রতিবাদ দিবসে আসামের গুয়াহাটিতে বিক্ষোভ

বহুজাতিক লুটেরাদের হাতে খাদ্যপণ্যকে তুলে দেওয়ার

সরকারি নীতির পরিণামেই লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি

মূল্যবৃদ্ধির আগুনে রীতিমতো জ্বলছে মানুষ। বিশেষ করে কাঁচালঙ্কা, টম্যাটো, আদা সহ শাকসবজির দাম আকাশ ছুঁয়েছে। কেন এই অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধি? সরকার বলছে, প্রতিকূল আবহাওয়াই এর জন্য দায়ী।

কিন্তু এ কথা বলে সরকার রেহাই পেতে পারে কি? শুধু তো শাকসবজি নয়, চাল-গম-ডাল-মাছ-ডিম সহ সমস্ত খাদ্যপণ্যেরই দাম অনেকখানি বেড়েছে। অন্যদিকে ভয়ঙ্কর হারে বেড়েছে গ্যাসের দাম। এর পিছনে তো প্রকৃতির খামখেয়ালকে দায়ী করা চলে না!

আসলে যা হোক কিছু কারণ খাড়া করে মূল্যবৃদ্ধির দায় এড়াতে চাইছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উভয়েই। তাহলে কি যত দিন যাবে, ততই সাধারণ মানুষ আরও বেশি করে মূল্যবৃদ্ধিতে জেরবার হতে থাকবে? সংসার চালাতে কি আরও বেশি করে ওষুধের খরচ কমিয়ে, ছেলেমেয়ের পড়াশোনা খরচ কাটছাঁট করে মূল্যবৃদ্ধির আগুনে বিসর্জন দিতে থাকবে বহু কষ্টে উপার্জন করা টাকাটুকু?

আগে একটা কথা অনেকেই ঠাট্টাচ্ছলে বলত, একদিন আসবে যখন টাকার থলেটা বড়, আর বাজারের থলেটা ছোট হবে। সেদিন এসে গেছে। এখন গোটা বাজার ঘুরে পকেট পুরো ফাঁকা হয়ে গেলেও বাজারের থলের অর্ধেকও ভরে না।

দেশে কেন্দ্রে-রাজ্যে নির্বাচিত সরকার রয়েছে, শত শত জনপ্রতিনিধি রয়েছেন, মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধে তাদের ভূমিকা কী? মানুষ যখন মূল্যবৃদ্ধিতে পুড়ছে, তখন তা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মুখে একটি কথাও শোনা যাচ্ছে না। যখন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বেড়ে চলেছে চড়চড় করে, খাদ্যের অভাবে এবং অপুষ্টিতে যখন

সাতের পাতায় দেখুন

বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী দার্শনিক, সর্বহারার মহান নেতা
কমরেড শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষে

৫ আগস্ট

ব্রিগেড চলো

বেলা - ১২টা

প্রধান বক্তা : কমরেড প্রভাস ঘোষ

বক্তা : কমরেড সত্যবান

সভাপতি : কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ

পতাকা উত্তোলন : কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

পঞ্চায়েত নির্বাচন ঃ পাইয়ে দেওয়ার স্লোগান

একের পাতার পর

যার পোশাকি নামই সংসদীয় গণতন্ত্র!

ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করবে কে? বিজেপির প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে রাজ্যে 'ডবল ইঞ্জিন' সরকার চাই। না হলে কেন্দ্রের উন্নয়নের টাকার ভাগ রাজ্যে পৌঁছবে না। রাজ্যে অন্য কোনও দলের সরকার থাকলে তারা পঞ্চায়েতের ভোটে বোঝায়, দেখ বাপু, আমরাই সরকারে আছি, আমাদের না জেতালে তোমাদের গ্রামের উন্নয়ন বন্ধ! সামান্য একটা রেশন কার্ড, বিপিএল কার্ড কোনও কিছুই শাসকদলের আনুগত্য ছাড়া মিলবে না। এই ব্যাপারে কোনও শাসকদলই কিছু কম যায় না। সিপিএম রাজ্য সরকারে থাকার সময় জয়নগর-কুলতলিতে বোঝাত 'এসইউসিআই-কে ভোট দিয়ে কী হবে? আমরা রাজ্য সরকারে আছি, আমরাই তোমাদের সব সুবিধা পাইয়ে দেব।' বিজেপি যেখানে রাজ্যে ক্ষমতায় আছে সেখানে এই ভাষাতেই পঞ্চায়েত ভোটের কথা মানুষকে বোঝায়। তৃণমূল হুবহু এক ভাষাই রপ্ত করেছে। এটাই ভোটের ব্র্যান্ড স্লোগান। এর মধ্যে কোথায় বিকেন্দ্রীকরণ? এ তো চূড়ান্ত কেন্দ্রীকরণ। এই বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের হাড়ে-মজ্জায় কোথাও জনগণের জন্য ক্ষমতার কথাটাই নেই— তার বিকেন্দ্রীকরণের প্রশ্নটাই তাই ওঠে না। তাই ভোটবাজ সংসদীয় দলগুলিরও ভাষা সেই লাইনই অনুসরণ করে থাকে।

তা হলে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা কী করে? সরকারের প্রশাসন আমলা বাহিনীর যে কাজগুলো করার কথা ছিল, সেগুলিই তাদের হয়ে পঞ্চায়েত করে দেয়। পঞ্চায়েতের বাবুরা হয়ে ওঠেন এক একজন গ্রামীণ আমলা, যাদের দাপটে মাথা নিচু না করে সাধারণ মানুষের কোনও উপায় নেই। গ্রামীণ মানুষের জীবনে পাড়াগত সালিশি বিচার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। এ ক্ষেত্রে থানাকে কন্ট্রোল করে সরকারি দল। তারা পুলিশকে দিয়ে চাপ দেয়, ভোট না দিলে পুলিশের ভয় দেখায়। পঞ্চায়েত আজ গ্রামীণ জনগণের ওপর শাসকশ্রেণির দাপট প্রতিষ্ঠার বড় হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। মোদি সরকার এখন পশ্চিমবঙ্গে বলতে শুরু করেছে— টাকা যাবে 'পিএম টু ডিএম', মানে একেবারে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সরাসরি জেলাশাসকের হাতে টাকা পৌঁছে যাবে। মাঝখানে রাজ্য সরকারের কোনও ভূমিকাই থাকবে না। সেই টাকা এবার পঞ্চায়েত কোন খাতে, কী ভাবে কতটুকু খরচ করবে তাও একেবারে ছক বেঁধে দেওয়া আছে। নীতিগত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার এতটুকু ক্ষমতা পঞ্চায়েতের নেই। কোন রাস্তা তৈরি হবে, কোন কাজটায় অগ্রাধিকার হবে, তা ঠিক হওয়ার কথা ছিল গ্রাম সংসদের মিটিংয়ে। সেই সংসদও এখন খাতায় কলমে একটা ব্যবস্থা। খুব বেশি হলে ক্ষমতাবানদের পক্ষে হাত তোলাই এই সংসদের কাজ। পঞ্চায়েতের মধ্য দিয়ে একচেটিয়া মালিকদের স্বার্থবাহী নীতিগুলি কোন দল সবচেয়ে ভালভাবে বহন করতে পারে তার ভিত্তিতেই ঠিক হয় সংবাদমাধ্যম কখন কাকে প্রচার দেবে, কার পিছনে মালিকরা টাকা ঢালবে। তাই এখন পঞ্চায়েতের ভোট নিয়ে শুরু হয়েছে হরেক সমীক্ষা, কে জিতবে কে হারবে এই হাওয়া তুলে ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে কে সঠিক কে বেঠিক এই প্রশ্নটাকেই। যেন যে জিতবে তার পিছনে থাকলেই সাধারণ মানুষের মোক্ষলাভ হয়ে যাবে! ন্যায় জিতবে না অন্যায় জিতবে এই প্রশ্নটাই যেন অবান্তর! সৎ, জনমুখী, কর্মঠ, সঠিক রাজনীতি নিয়ে চলা কোনও প্রার্থীকে জেতানোর চেয়ে দলের রং, টাকার জোর, সমাজবিরোধী কন্ট্রোল করার জোর কার বেশি সেই দেখেই তার দিকে মানুষের ঢলে পড়াটাকেই বলা হচ্ছে নির্বাচনী গণতন্ত্র।

পঞ্চায়েত ভোটে এস ইউ সি আই (সি) ছাড়া নানা কিসিমের ঝান্ডাধারী দলের বক্তব্য শুনলে কী পাওয়া যায়? তৃণমূল বলছে তোমাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিয়েছি, নানা 'শ্রী' নামে নগদ টাকা দিয়েছি, ক্লাবে টাকা দিয়েছি অতএব আমাদের ভোট দাও। বিজেপি বলছে কেন্দ্র আরও বেশি দিতে পারে তাই আমাকে দাও। সিপিএম বলছে আমরা ক্ষমতায় থাকার সময় তোমাদের পাইয়ে দিয়েছি, এবার ক্ষমতায় এলে আরও পাইয়ে দেব। একটা টিউবওয়েল, কয়েক ফুট রাস্তায় ইট ফেলা, কয়েকটি বিদ্যুতের খুঁটি, একটা জবকার্ড, আবাস যোজনার একটা ঘর, কোনও একটা লোন এই সব দেখিয়েই দলগুলো ভোট চায়। তারা মানুষের মনটাকে এমনভাবে তৈরি করার চেষ্টা করে যেন সামান্য কোনও সুবিধা পাইয়ে দিয়ে নেতারা একেবারে কৃতার্থ করে দিয়েছেন! অথচ বলে না, এগুলো তোমার অধিকার, না পেলে চলো তোমাকে সঙ্গে নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে লড়ে এই অধিকার আদায় করব। পঞ্চায়েতে এই দলগুলোর ভূমিকা মানুষের রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনকে চরম বাধাগ্রস্ত করছে। এ হল মানুষকে সমস্যা সমাধানের রাস্তা না দেখিয়ে তাকে সুবিধার মুখাপেক্ষী করে তোলার নোংরা রাজনীতি। ঠিক যেন একজন কুয়োয় পড়া মানুষকে উদ্ধার করার চেষ্টা না করে ওই কুয়োতেই তাকে আটকে রেখে জল, খাবার অক্সিজেন দিয়ে বাঁচিয়ে রেখে কৃতিত্ব দেখানো! দুর্নীতির প্রশ্নেও দলগুলির দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় এক। নিজেদের ওপর দুর্নীতির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ খণ্ডন করার জন্য তাঁরা সকলেই সাধারণত অন্যদের দুর্নীতির কথা তোলেন। যুব সমাজের বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে এরা গ্রামে গ্রামে যুবকদের অর্থের বিনিময়ে অনৈতিক পথে ঠেলে দেয়। তাদের অস্ত্রধারী সমাজবিরোধীতে পরিণত করে। তারাই হয়ে যায় পঞ্চায়েত থেকে লোকসভা বিধানসভা সব ভোটে ক্ষমতাবানদের জেতার হাতিয়ার। যে যত টাকা ছড়াতে পারে, প্রশাসনকে কব্জা করতে পারে, সংবাদমাধ্যমের সমীক্ষায় নিজের কোলে ঝোল টানতে পারে সেই জেতে। এ হল জনসাধারণের ওপর দাপট জারি রাখার হাতিয়ার। এর নামই গণতন্ত্র!

পঞ্চায়েতে গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন কেমন ঘটেছে? মানুষের অভিজ্ঞতা, মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ চালু হওয়ার পর থেকে নানা সময় সরকারি ক্ষমতায় বসা ভোটবাজ দলগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতাশালী নেতাদের স্ত্রীদেরই পঞ্চায়েতে জিতিয়ে নিজেদের মৌরসীপাট্টা কায়েম রাখার চেষ্টা করে গেছে। পঞ্চায়েতে মেয়েরা জিতেছেন, প্রধানও হয়েছেন, কিন্তু তাঁদের সামাজিক অবস্থানের উন্নতি, পরিবারের তাঁদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে গ্রামের জন্য প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা কতটুকু বেড়েছে? যাঁরা খোঁজ রাখেন জানেন, বাড়েনি। গ্রামে গার্হস্থ্য হিংসা, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন বন্ধ করা গেছে? মেয়েদের শিক্ষার হার, স্বাস্থ্যের উন্নতি বেড়েছে? তথ্য বলছে, একেবারেই না। মেয়েদের জীবন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ আর পুঁজিবাদী শোষণের যৌথ জাঁতাকলে দ্বিগুণ নিষ্পেষিত। সব মিলিয়ে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা শোষণমূলক, দুর্নীতিগ্রস্ত পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই নিম্নতম ইউনিট।

বুর্জোয়া রাজনীতির এটাই আজকের পরিণতি। পঞ্চায়েত কিংবা বিধানসভা কিংবা লোকসভা কোথাও আজ মানুষের কণ্ঠস্বর এই রাজনীতি তুলে ধরে না। যত দিন যাচ্ছে এই রাজনীতির আরও কুৎসিত নোংরা রূপ বেরিয়ে আসছে।

এই স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে এস ইউ সি আই (সি) মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার আলোয় নিয়ে এসেছে এক সম্পূর্ণ আলাদা রাজনীতির পথ। মানুষের কাছে উপস্থিত করেছে তাদের অধিকারের কথা। গণকমিটির ভিত্তিতে পঞ্চায়েত পরিচালনা ও অধিকার আদায়ের জন্য গণআন্দোলন গড়ে তুলে সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচার রাস্তা শেখায় এই রাজনীতি। ভোটেও এই রাজনীতিকেই শক্তিশালী করা ছাড়া আজ রাস্তা নেই।

মহান নেতার শিক্ষা থেকে

একের পাতার পর

গঠন করে তুলি— রুচি, সংস্কৃতির আধারটা তৈরি করে তুলি, আর রাজনৈতিক কর্মক্ষমতাকেও আমরা বাড়িয়ে ফেলতে পারি, এবং আমাদের আন্দোলনের প্রক্রিয়া, গতিপ্রকৃতি, কায়দাকানুন, কৌশলগুলোও আমরা ক্রমাগত উন্নত করতে পারি এবং সব সময়েই তাকে 'ডায়নামিক' স্তরে রাখতে পারি।

এই জন্য নানা দিক থেকে আমাদের জানতে হয়, পড়তে হয়। ...''

এক মহান বিপ্লবী চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য

শিবদাস ঘোষ নির্বাচিত রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড

জীবনাবসান

দলের পুরুলিয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলায় মানবাজার লোকালের কর্মী এবং ছাত্রনেতা কমরেড বৈদ্যনাথ গোপ মণ্ডল ২৮ মে মানবাজার হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মাত্র ৩২ বছর বয়সে এই সম্ভাবনাময় বিপ্লবী কর্মীর মৃত্যুতে দলের কর্মী-সমর্থক ও এলাকার সাধারণ মানুষ গভীর শোকপ্রকাশ করেন।

ছাত্র আন্দোলনের নানা কাজ করতে করতেই তিনি এআইডিএসও-র সঙ্গে যুক্ত হন ও দলের পত্রপত্রিকার একনিষ্ঠ পাঠক হয়ে ওঠেন। গণদাবী বিক্রি ও পড়ায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। এলাকায় সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলার প্রচেষ্টাও শুরু করেছিলেন। অমায়িক ব্যবহার, উন্নত রুচিবোধ দিয়ে তিনি মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারতেন। সাংসারিক অভাব অনটন সত্ত্বেও তিনি দলের একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে হাসিমুখে কাজ করে গেছেন।

কৈশোরেই তাঁর হৃদযন্ত্রের সমস্যা ধরা পড়ে। ২০০৮-এ একবার অপারেশনও হয়। ২০২২-এর সেপ্টেম্বরে তিনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়লে দলের কর্মী-সমর্থক ও এলাকার মানুষের সহযোগিতায় কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে তাঁর হৃদযন্ত্রের জটিল অপারেশন সফল হয়। দীর্ঘ আট মাস চিকিৎসার পর তিনি সুস্থ হয়ে উঠছেন এই আশা যখন দেখা দিচ্ছিল, সেই সময়েই হৃদযন্ত্রের আকস্মিক জটিলতায় তাঁর জীবনের গতি রুদ্ধ হয়ে গেল।

২৯ জুন মানবাজরের ধাদকিডি গ্রামে কমরেড বৈদ্যনাথ গোপ মণ্ডলের স্মরণসভায় পাঁচশতাধিক মানুষ অংশ নেন। বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অসিত মণ্ডল ও পুরুলিয়া জেলা নেতৃবৃন্দ।

কমরেড বৈদ্যনাথ গোপ মণ্ডল লাল সেলাম

ঘাটশিলায় হুল দিবস উদযাপিত

ঝাড়খণ্ডের ঘাটশিলায় শিবদাস ঘোষ মেমোরিয়াল ফ্রি কোচিং স্কুলে ঐতিহাসিক সাওতাঁল বিদ্রোহ স্মরণে হুল দিবস পালন। ৩০ জুন

পঞ্চায়েত নির্বাচনে পরিবেশ সমস্যা উপেক্ষিতই

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক সমস্যার মতোই যে পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাগুলি জনজীবনকে ভয়ানক ভাবে ব্যাহত করছে পঞ্চায়েত পৌরসভা বিধানসভা বা লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের দিকে তাকালে তা বোঝার কোনও উপায় নেই। সরকারি বা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো এই বিষয়গুলি নিয়ে কোনও স্পষ্ট বক্তব্য বা কর্তব্যের কথা জনসাধারণের কাছে রাখছে না। পরিবেশ ও মানবজীবনের যে পরিপূরক সম্পর্ক তা উপলব্ধি করে এ বিষয়ে ইতিবাচক দাবি তোলার ক্ষেত্রে ভোটারদের তরফ থেকেও কোনও প্রচেষ্টা লক্ষ করা যাচ্ছে না। 'সবুজ মঞ্চ' নামে একটি পরিবেশ সংগঠন এই দিকে রাজনৈতিক দলগুলির দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ইস্তাহার প্রকাশ করেছে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপণা বিধি ২০১৬ লংঘন করে গ্রাম শহর সর্বত্র নিষিদ্ধ প্লাস্টিক দ্রব্যের ব্যবহার যথেচ্ছ বাড়ছে। এগুলি পোড়ানোতে মারাত্মক দূষণ হচ্ছে। এগুলো নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রশাসনের ভূমিকা জরুরি। নদী, জলাভূমি, জলাশয় সংরক্ষণের কোনও প্রচেষ্টা সরকারি তরফে লক্ষ করা যাচ্ছে না। কোথাও তীব্র জলসংকট, কোথাও নদীর গতিপথের পরিবর্তন, নদীর পাড় ভাঙন ইত্যাদি নদী-তীরবর্তী মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলছে। নদী, জলাভূমি, জলাশয়ে পৌর আবর্জনা ছাড়াও কলকারখানার বিষাক্ত আবর্জনা, চাষে ব্যবহৃত কীটনাশক চরম দূষণ তৈরি করছে। জলাভূমি, জলাশয় বুজিয়ে ফেলার প্রবণতা বাড়ছে। রাজ্যের উপকূলবর্তী এলাকা পর্যটনের নামে ধ্বংস করা হচ্ছে। সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ ধ্বংস, সমুদ্রতটের উপর সবুজ ধ্বংস করে জোয়ার-ভাটার এলাকায় হোটেল, বাজার নির্মাণ, বালিয়াড়ি ধ্বংস, সমুদ্রতটের উপরে অপরিমিত যান চলাচল, সমুদ্র বন্দর তৈরির উদ্যোগ উপকূলের পরিবেশ ক্রমান্বয়ে নষ্ট করছে। কোস্টাল রেগুলেশন জোন নোটিফিকেশন-২০১৯-এ উপকূল রক্ষার জন্য যেটুকু বিধিনিষেধ আছে তা মানা হচ্ছে না। অন্য দিকে সুন্দরবনের নদীখাড়িতে এবং সমুদ্রতট-নির্ভর ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জীবিকা ক্রমশ সংকুচিত হয়ে পড়ছে। জীবন-জীবিকা থেকে উচ্ছেদের আশঙ্কায় তাদের দিন কাটাতে হচ্ছে।

রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ভূগর্ভের জল স্তর ক্রমাগত এবং বিপজ্জনক ভাবে নিচে নেমে যাচ্ছে। চাষাবাদের কাজে, গ্রামাঞ্চলে কলকারখানার কাজে ও বহুতল বাড়ির কমপ্লেক্সের বাসিন্দাদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ভূগর্ভের জল তোলা হচ্ছে। ভূগর্ভের জল নিয়ে ব্যবসাও চলছে বিপুলভাবে। 'আর ও' নামে সাধারণ অপরিশোধিত জলই সাধারণ মানুষকে কিনে খেতে বাধ্য করা হচ্ছে। এসডব্লুআইডি-এর অনুমতি ছাড়া ভূগর্ভের জল তোলায় নিষেধাজ্ঞা থাকলেও প্রায় কোথাও তা মানা হয় না। অন্য দিকে বৃষ্টির জল ধরে রাখার উদ্যোগ বিরল। বিভিন্ন এলাকায় জলে আর্সেনিক এবং ফ্লুরাইডের উপস্থিতিও জনস্বাস্থ্যের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। বনাঞ্চল ধ্বংস করে শুধু সরকারি প্রকল্প নয়, ব্যক্তিগত মালিকানায় রিসর্ট থেকে হাউজিং ক্রমশ বেড়ে চলেছে। লক্ষ লক্ষ গাছ কাটা হচ্ছে। শুধু বনাঞ্চল নয়, রাস্তা চওড়া করার নামে, ব্রিজ তৈরির নামে, হাউজিং তৈরির নামে অসংখ্য পুরনো গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। জলপাইগুড়ির লাটাগুড়িতে গোরুমারা জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন পরিবেশের পক্ষে সংবেদনশীল অঞ্চলে হাউসিং কমপ্লেক্স গড়ে তুলে, পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ের টুর্গা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরির জন্য লক্ষ লক্ষ গাছ কাটা হয়েছে এবং হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের বহু জায়গায় রাস্তা নির্মাণ এবং ব্রিজ নির্মাণের নামে ধ্বংস করা হচ্ছে অসংখ্য গাছ। উত্তরবঙ্গের বাগড়াকোট, সিকিম হাইওয়ে নির্মাণ, সেবক রংপো রেলওয়ে লাইন বসানোর জন্য লক্ষ লক্ষ গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। মালদা সহ বিভিন্ন জেলায় সমৃদ্ধ আমবাগান ধ্বংস করে একের পর এক প্লট তৈরি করা হচ্ছে। এ ভাবে নির্বিচারে প্রকৃতি ধ্বংসের বিরূপ প্রভাব পড়ছে মানুষের জীবনে।

স্পঞ্জ আয়রন, ফেরোঅ্যালয়, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, সিমেন্ট কারখানা, স্টোন ক্র্যাশার ইত্যাদি যে সমস্ত শিল্প ইউনিটের দূষণ তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে, সেগুলি নীতি অনুযায়ী পঞ্চায়েত এলাকাতেই হয়ে থাকে। ইউনিটগুলি স্থাপনের প্রাথমিক অনুমোদন পঞ্চায়েতকেই দিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের যেখানেই এই শিল্পগুলি রয়েছে সেগুলির প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক দূষণ তৈরির অভিযোগ রয়েছে। এইসব শিল্পের শ্রমিক, এলাকার সাধারণ মানুষ, বিশেষত বয়স্ক এবং শিশুরা চূড়ান্ত দূষণের শিকার। এলাকার গবাদি পশু, জলাশয়, চাষের খামার, বন্যপ্রাণী এই দূষণের শিকার।

পাহাড় এলাকায় সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পরিবেশ। কোনও নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা না করে যথেচ্ছ কংক্রিটের নির্মাণ মাথা তুলছে। নদী ঝোরা জলস্রোতগুলি বন্ধ করে ব্যাপক হারে বনভূমি ধ্বংস করে একটার পর একটা নির্মাণ হয়েছে। নদীগুলির গর্ভে একটার পর একটা স্টোন ক্র্যাশার ইউনিট বসছে। কোনও নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা না করে বিস্তীর্ণ এলাকা ধূলিকণায় আচ্ছন্ন করে ফেলা হচ্ছে। ব্যাঙের ছাতার মতো একটার পর একটা হোটেল তৈরি হচ্ছে। ইকো ট্যুরিজম আর হোম-স্টের নাম করেও বিশাল বিশাল হোটেল তৈরি হচ্ছে। যে বিপুল পরিমাণ আবর্জনা তৈরি হচ্ছে তা সরানোর উদ্যোগ নেই। পাহাড়ের কোণে কোণে জমে উঠছে প্লাস্টিক সহ অন্যান্য আবর্জনার স্তূপ। পাহাড়ে এইসব দূষণের প্রভাব পড়ছে। এসব ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন হিসাবে পঞ্চায়েতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু এ বিষয়ে চাই সরকারের পক্ষ থেকে সামগ্রিক পরিকল্পনার রোড ম্যাপ। সেটাই অনুপস্থিত। পরিবেশের কী ক্ষতি হল, মানুষের জীবন কীভাবে বিপন্ন হল ভাবার দায় পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিচালকদের নেই। আশু লাভটাই তাদের বিচার্য। সরকারের ভূমিকাও তাই। ফলে পরিবেশের বিপন্নতার ধারা প্রবহমান। এসইউসিআই-কমিউনিস্ট দীর্ঘদিন ধরে পুঁজিবাদী উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় মারাত্মক পরিবেশ ধ্বংসের বিরুদ্ধে একদিকে জনগণকে সচেতন করার প্রক্রিয়া অন্যদিকে এই প্রক্রিয়ায় পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। আর্সেনিক, স্পঞ্জ আয়রন, তাপবিদ্যুতের ছাই দূষণের বিরুদ্ধে নানা স্থানে দলের কর্মীরা আন্দোলন গড়ে তুলছেন। জনসভাগুলিতে সাধারণ সম্পাদক তাঁর বক্তৃতায় পরিবেশ দূষণের ভয়াবহতাকে তুলে ধরেছেন। এই পরিস্থিতিতে ভোটাররা প্রশ্ন তুলুন, পঞ্চায়েতের পরিবেশ রক্ষায় কী ভূমিকা নেবে তা ক্ষমতায় এলে জনগণকে জানাতে হবে। জনগণকেও ভাবতে হবে পরিবেশ রক্ষার দায় তারও। তার দায় দুভাবে। এক, পরিবেশ দূষণ না করা, দুই, সরকারের ভূমিকা সক্রিয় করার ক্ষেত্রে সমালোচনা, জনপ্রতিবাদ গড়ে তোলা। আওয়াজ তুলুন, মুনাফার জন্য প্রকৃতি-পরিবেশ ধ্বংস করতে দেব না।

সাধারণ সংসারেও ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম আছে

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু আরএসএস তথা বিজেপির একটি মূল রাজনৈতিক কর্মসূচি। সেই কর্মসূচিকেই দেশে চালু করতে উঠেপড়ে লেগেছেন প্রধানমন্ত্রী। অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে তিনি দলের এক কর্মীসভায় বলেছেন, "কোনও পরিবারের যদি প্রত্যেক সদস্যের জন্য আলাদা আইন থাকে, তা হলে কি সেই সংসার চালানো যায়?" প্রধানমন্ত্রী ভেবেছেন বোধহয় একটি জবরদস্ত উদাহরণ তিনি দিয়েছেন। কথাটি হঠাৎ শুনলে তা মনে হতেও পারে যে, ঠিকই তো, যদি একই পরিবারের প্রত্যেকের জন্য আলাদা আইন থাকে তা হলে মুহূর্তে মুহূর্তে সংঘর্ষ বাধবে এবং সংসারও অচল হয়ে পড়বে। কিন্তু একটু গভীরে ভাবলেই বোঝা যাবে কথাটি প্রধানমন্ত্রী সস্তা হাততালি পাওয়ার জন্যই বলেছেন।

সবাই জানেন, পরিবারে কতগুলো নিয়ম বা অলিখিত বিধি থাকে এবং তা প্রত্যেক সংসারেই থাকে। তা না থাকলে সংসার চলে না এবং সেই বিধি সংসারের সব সদস্যের জন্য এক নয়। সংসারে একজন শিশুকে যে ভাবে দেখা হয় সে ভাবে অন্যদের দেখা হয় না। আবার প্রবীণদের জন্য সংসারে কতগুলো বিধি থাকে যা অন্যদের জন্য থাকে না। ছোটদের চলাফেরা নিয়ে যে বিধিনিষেধ থাকে তা বড়দের জন্য থাকে না। কারও হয়তো সন্ধ্যা আটটার মধ্যে বাধ্যতামূলক বাড়ি ফেরার নিয়ম, আবার রোজগেরে কাউকে গভীর রাত পর্যন্ত কর্মক্ষেত্রে থাকতে হয়। খাওয়াদাওয়ার ক্ষেত্রেও দেখা যায় শিশুদের জন্য একরকম খাবার, বয়স্কদের জন্য আর এক রকম, আবার বাকিদের জন্য আর একরকম। পরিবারের সবচেয়ে দুর্বল সদস্য যে, তার জন্য একটু বিশেষ ব্যবস্থা করা পরিবারের বাঁধুনি শক্ত করে। এই যে পার্থক্য, এটা প্রয়োজন থেকেই। সেই প্রয়োজনটা সংসারের সদস্যদের কল্যাণের জন্যই। তাতে কখনও সংসারে সংঘর্ষ বাধে না। বরং এমন বিধিনিষেধ যে-সংসারে নেই, সেই সংসারই আর সংসার থাকে না, মেসবাড়ি হয়ে যায়। ফলে এক দেশ এক আইন বোঝাতে প্রধানমন্ত্রী যে সংসারের যুক্তি দিয়েছেন তা নেহাতই ছেঁদো।

সংসার কী ভাবে চলে প্রধানমন্ত্রী বোধহয় তার খোঁজই রাখেন না। ফলে এই তুলনা বাদ দেওয়াই ভাল। কিন্তু যেটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, তা হল, প্রধানমন্ত্রী কি নিজে দেশটাকে একটা সংসারের মতো ভাবেন, যার কর্তা তিনি? তিনি কি সত্যিই মনে করেন, হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, অন্য ধর্মাবলম্বীরা, আদিবাসী, বনবাসী, জনজাতি, পাহাড়বাসী সবাই সেই এক পরিবারের সদস্য? আর সেই সব সদস্যের মঙ্গলের জন্যই তিনি অভিন্ন আইন আনতে চাইছেন? প্রধানমন্ত্রী তথা বিজেপির গত এক দশকের শাসনের দিকে তাকালে কি তাই মনে হয়?

বিজেপির গত এক দশকের ইতিহাস আসলে মুসলিম এবং অন্য ধর্মের মানুষদের বিরুদ্ধে লাগামহীন বিদ্বেষ তৈরির ইতিহাস। ইতিহাসে মুসলিম যুগকে মুছে ফেলতে উঠেপড়ে লেগেছেন তাঁরা। তাদের খাদ্যের অধিকার, ধর্মাচরণের অধিকার, ভারতীয় হিসাবে গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে বসবাসের অধিকার একের পর এক কেড়ে নিচ্ছেন তাঁরা। খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধেও একই রকমের আচরণ তাঁদের। প্রধানমন্ত্রীরা তো হিন্দুরাষ্ট্র কায়েম করার কথা বলেন? তবে হিন্দুসমাজের মধ্যে যে হাজারটা বিভাজন-বৈষম্য রয়েছে সেগুলি দূর করতেই বা তৎপর হন না কেন তাঁরা? তিনি তো সদ্য আমেরিকায় গিয়ে গলার শির ফুলিয়ে বলে এলেন, ভারতের শিরায় শিরায় নাকি গণতন্ত্রের প্রবাহ চলেছে। তা হলে এ কেমন গণতন্ত্র যেখানে জন্মের ভিত্তিতে অধিকার নির্ধারিত হয়? গণতন্ত্রে তো সকল নাগরিকের সমান অধিকার। কিন্তু এখনও কেন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই উঁচু জাত নিচু জাত টিকে রয়েছে? কেন তথাকথিত নিচু জাতের একটা বড় অংশের মানুষ তাঁদের ইচ্ছামতো সব হিন্দু মন্দিরে ঢোকার অনুমতি পান না। কেন আজও বহু প্রদেশে ব্রাহ্মণ এলাকার কুয়ো বা পুকুরে জলপানেরও অধিকার নিম্নবর্ণের মানুষের নেই? কেন আজও পরিবারের সম্মান রক্ষায় হত্যা বহাল তবিয়তে চলছে? কেন নিম্নবর্ণের উপর উচ্চবর্ণের মানুষের অত্যাচার ধারাবাহিক ভাবে চলতে পারছে? এ-সব বন্ধ করতে নরেন্দ্র মোদির সরকার কী ব্যবস্থা নিয়েছে? সমাজ জুড়ে যুগ যুগ ধরে যে হাজারটা বৈষম্য অনড় হয়ে রয়েছে, যার জন্য নতুন করে আইন করতে হবে না, আবার এমন বহু বৈষম্যের বিরুদ্ধে আইন রয়েছে অথচ কার্যকর হয় না, সেই সব বৈষম্য দূর করতে এই তৎপরতার ছিটেফোঁটাও দেখা যায় না কেন?

নাগরিক পরিচয়ই তো গণতন্ত্রের মূল কথা। তবে ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র তৈরির ডাক তাঁরা দিচ্ছেন কীসের ভিত্তিতে? তাঁরা তাঁদের এক দশকের শাসনে সংখ্যলঘু মুসলমানদের প্রায় দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করে দিয়েছেন। তা হলে দেশের মানুষ যদি এ আশঙ্কা করে যে, বিজেপির অভিন্ন দেওয়ানি আইন তৈরির ডাক আসলে লোকসভা নির্বাচনের আগে অভিন্নতার নামে ভিন্নতাকে আরও খুঁচিয়ে তুলে হিন্দু ভোটকে একজোট করার উদ্দেশ্যেই, তার কী উত্তর দেবেন বিজেপি নেতারা?

কমিউনিস্ট ইস্তেহারের শিক্ষা থেকে

“আমরা ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান চাই শুনে আপনারা আতঙ্কিত। অথচ আপনাদের বর্তমান সমাজে জনসমষ্টির শতকরা নব্বই জনের বেলায় ব্যক্তিগত মালিকানা তো ইতিমধ্যে লোপ করা হয়েছে। অল্প কয়েকজনের ক্ষেত্রে সেটা আছে শুধু ঐ দশ ভাগের নয় ভাগ লোকের হাতে তা নেই বলে। সুতরাং, যে ধরনের মালিকানার অস্তিত্বের অপরিহার্য শর্ত হল সমাজের বিপুল সংখ্যাধিক লোকের কোনও সম্পত্তি না থাকা, সেটা আমরা তুলে দিতে চাই, এটাই আমাদের বিরুদ্ধে আপনাদের অনুযোগ।

এককথায়, আমাদের সম্বন্ধে আপনাদের অনুযোগ এই যে, আপনাদের মালিকানার উচ্ছেদ আমরা চাই। ঠিক তাইই, আমাদের সংকল্প ঠিক তা-ই।” ...

“সমাজের উৎপন্ন জিনিসে ভোগ-দখলের ক্ষমতা থেকে কমিউনিজম কাউকে বঞ্চিত করে না। এমন ভোগ-দখলের সাহায্যে অপরের শ্রম করায়ত্ত করার ক্ষমতা থেকেই শুধু কমিউনিজম তাকে বঞ্চিত করতে চায়।

আপত্তি উঠেছে যে, ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ হলে সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে যাবে, সর্বব্যাপী আলস্য আমাদের অভিভূত করবে।

এই মত ঠিক হলে বহু পূর্বেই নিছক আলস্যের টানে বুর্জোয়া সমাজের রসাতলে যাওয়া উচিত ছিল, কারণ ও-সমাজে যারা খাটে তারা কিছু অর্জন করে না, আর যারা কিছু অর্জন করে তারা খাটে না। গোটা আপত্তিটাই অন্য ভাষায় এই পুনরুক্তির শামিল। যখন পুঁজি আর থাকবে না তখন মজুরি-শ্রমও আর থাকতে পারে না।”

কার্ল মার্কস-ফ্রেডরিক এঙ্গেলস
কমিউনিস্ট ইস্তেহার

শিক্ষা বাঁচাতে কনভেনশন ভোপালে

শিক্ষার বেসরকারিকরণ, ব্যবসায়ীকরণ, সাম্প্রদায়িকীকরণ ও কেন্দ্রীয়করণের নীলনক্সা নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি প্রতিরোধে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির পক্ষ থেকে ১৮ জুন মধ্যপ্রদেশে ভোপালের হিন্দি ভবনে একটি কনভেনশনের আয়োজন করা হয়। বিপুল সংখ্যক শিক্ষক-অধ্যাপক-অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা এতে অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান বক্তা সর্বভারতীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দেবাশীষ রায় (ইনসেট) বলেন, এই নীতি শুধু শিক্ষার বেসরকারিকরণ বাড়াবে তাই নয়, এই পরিকল্পনা, শিক্ষাকে সঙ্কুচিত করবে এবং আগামী প্রজন্মকে বিজ্ঞানমনস্ক-ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করবে। তিনি বলেন, শিক্ষা এখন এত ব্যয়বহুল যে, দরিদ্র ও প্রান্তিক ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদি প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া রাস্তা নেই।

কমিটির রাজ্য আহ্বায়ক ডঃ রাম অবতার শর্মা বলেন, মধ্যপ্রদেশের মানুষ যে নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির বিরোধী, এই সম্মেলনের সাফল্যেই তা প্রমাণ হচ্ছে। আমাদের দাবি, প্রতি বছর বরাদ্দ না কমিয়ে বাজেটের ১০ শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় করতে হবে।

বক্তব্য রাখেন কমিটির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সদস্য সুরেন্দ্র রঘুবংশী, শচীন জৈন এবং মুদিত ভাটনগর। শিক্ষা বাঁচাতে পেশ করা প্রস্তাব নিয়ে সম্মেলনে আলোচনা হয়। শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। শিক্ষা আন্দোলন তীব্রতর করার লক্ষ্যে রাজ্য সম্মেলনের উদ্দেশ্যে ডঃ রাম অবতার শর্মাকে আহ্বায়ক করে রাজ্যস্তরে একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়।

রাশিয়ায় প্রিগোঝিন কাণ্ড
যুদ্ধেও আজ আউটসোর্সিং

ইউক্রেনের সঙ্গে দীর্ঘ সংঘর্ষের কারণে প্রায় প্রতিদিনই সংবাদমাধ্যমে রাশিয়ার নাম দেখতে পাওয়া খুব স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ রাশিয়ার একটা অন্য রকম খবরে মানুষের কৌতুহল তুঙ্গে উঠেছে। সঙ্গে জন্ম নিয়েছে নানা প্রশ্ন।

খবরে প্রকাশ, রাশিয়ার একটি বেসরকারি সামরিক বাহিনী ‘ওয়াগনার’-এর কর্তা ইয়েভগেনি প্রিগোঝিন ২৩ জুন রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। নিজের ভাড়াটে সেনাবাহিনী নিয়ে প্রিগোঝিন রাজধানী মস্কোর দিকে এগোতে থাকেন এবং ২৪ জুন রাজধানীর দুশো কিলোমিটারের কাছাকাছি পৌঁছে যান। শেষ পর্যন্ত বেলারুশের প্রেসিডেন্টের মধ্যস্থতায় পুতিনের সঙ্গে প্রিগোঝিনের একটা বোঝাপড়া হয় এবং সেনাদের নিরস্ত্র করে তিনি ফিরে যান।

প্রিগোঝিনের এই বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে নানা প্রশ্ন উঠে আসছে— কে এই প্রিগোঝিন, কেন তাঁর এই বিদ্রোহ, কী করে তাঁর বাহিনী বিনা বাধায় মস্কোর কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারল, ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রশ্নগুলির সব উত্তর স্পষ্ট নয়। নানা সংবাদসংস্থা থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে নানা লেখা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। জানা গেছে, প্রথম জীবনে ইয়েভগেনি প্রিগোঝিন খাবার সরবরাহ অর্থাৎ ক্যাটারিংয়ের ব্যবসা করতেন। সেখান থেকে প্রেসিডেন্ট পুতিনের নেকনজরে আসেন তিনি। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নানা ব্যবসা থেকে মুনাফা করতে করতে আজ তিনি রাশিয়ার একজন নামজাদা কর্পোরেট পুঁজিপতি। এই উত্থানের পিছনে রয়েছে প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা। ২০১৪ সালে একটি বেসরকারি সামরিক বাহিনী গঠনের কথা তাঁর মাথায় আসে। তৈরি হয় ‘ওয়াগনার প্রাইভেট মিলিটারি কোম্পানি’। শোনা যায়, সেইসময় রাশিয়ার ক্রিমিয়া অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ওয়াগনার। পরে ওয়াগনার অন্য দেশে রুশ সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির পাহারাদার হিসাবে কাজ চালাতে থাকে। লিবিয়া ও মধ্য আফ্রিকার নানা দেশে রুশ কর্পোরেট পুঁজিপতিদের কেনা খনি সহ নানা প্রাকৃতিক সম্পদ পাহারা দেওয়ার কাজ করে প্রিগোঝিনের পেশাদার ভাড়াটে সেনাবাহিনী। ওইসব দেশের ভিতরকার নানা সংঘর্ষেও মালিকের নির্দেশমাফিক যোগ দেয় তারা। এই ওয়াগনার সেনারা ইউক্রেনের সঙ্গে রাশিয়ার সাম্প্রতিক যুদ্ধেও নাকি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, ইউক্রেনে যুদ্ধ চালানোর সময়ে নানা প্রশ্নে রাশিয়ার সরকারি সেনাবাহিনীর সঙ্গে ওয়াগনারের বিরোধ বাধে। সেই বিরোধ মেটাতে প্রেসিডেন্ট পুতিন উদ্যোগী হননি বলে অনেকদিন ধরেই অভিযোগ জানিয়ে আসছিলেন প্রিগোঝিন। এই বিরোধেরই এক পর্যায়ে নিজের বাহিনী নিয়ে মস্কো অভিযানে নামেন তিনি। এ নাকি ছিল তাঁর ‘ন্যায়ের দাবিতে পদযাত্রা। অন্তত তাঁর নিজের বক্তব্য এমনই। যদিও রাশিয়ার বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির মতে, প্রিগোঝিনের এই অসমাপ্ত অভ্যুত্থানের পিছনে রয়েছে রাশিয়ার একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীগুলির নিজেদের ভিতরকার দ্বন্দ্ব। অনেকের মতে এই দ্বন্দ্বে কোনও একটি গোষ্ঠীর ‘বোড়ে’ হিসাবে কাজ করেছেন প্রিগোঝিন।

প্রিগোঝিনের মস্কো অভিযানের পিছনে কারণ যাই থাক, এই ঘটনা থেকে একটি সত্য সামনে চলে এল। দেখা যাচ্ছে, আজকের দিনে পুঁজিপতিরা শুধু ব্যাক-অফিস বা এই ধরনের কাজগুলি কম পয়সায় সারতে আউটসোর্সিং করে তাই নয়, যুদ্ধেও এখন চলে আউটসোর্সিং। আর্থিক ভাবে ক্রমাগত নিচের দিকে নামতে থাকা সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার অভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে সামগ্রিক ভাবে যখন মন্দার ছায়া, তখন যুদ্ধের এই আউটসোর্সিং আজকের দিনে পুঁজিপতিদের মুনাফার একটি চমৎকার উৎস হিসাবে নিজের জায়গা করেছে।

প্রিগোঝিনের ওয়াগনার কোম্পানি দেখিয়ে দিয়ে গেল, যুদ্ধ শুধু দেশের সেনাবাহিনী করে না, বেসরকারি মালিকরাও কোম্পানি খুলে যুদ্ধ করতে পাঠায় ভাড়াটে সেনাদের। বিনিময়ে সরকারের কাছ থেকে যে বিপুল টাকা মালিক পায়, ভাড়াটে সেনাদের পাওনা মেটাবার পরে তার একটা বড় অংশ মুনাফা হিসেবে থেকে যায় তার নিজের পকেটে। ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়ায় হানাদারিতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটে সেনারা কীভাবে অত্যাচার চালিয়েছিল, মানুষের তা মনে আছে।

অর্থাৎ যুদ্ধের সঙ্গে আজ আর দেশরক্ষার তাগিদ তথা দেশপ্রেম জড়িয়ে নেই। এ এখন এক লাভদায়ক ব্যবসা। সেনাদের প্রাণ, তাদের ঘাম-রক্ত নিয়ে ব্যবসা করে মুনাফা লোটে প্রিগোঝিনের মতো যুদ্ধ-ব্যবসার মালিকরা। আর হতভাগ্য বেকার তরুণ-যুবকের দল রোজগারের তাগিদে, পরিবারের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার বাধ্যতায় প্রাণ বাজি রেখে নাম লেখায় ওয়াগনারের মতো সেনা-কোম্পানিতে। যুদ্ধ শেষ হতে হতে ঝরে যায় কত না জীবন। আর যারা ঘরে ফেরে, কেউ পঙ্গু হয়ে, কেউ বিনা-কারণে মানুষ-মারার গ্লানিতে ভেতরে ভেতরে মরে গিয়ে অভিশাপ দিতে থাকে এই সমাজকে, ‘পুঁজিবাদী সভ্যতা’ নামের এই অসভ্যতাকে।

মনে পড়ে যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা। এই রাশিয়া তখন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত। মহান স্ট্যালিনের প্রেরণায় গোটা দেশের প্রতিটি মানুষ প্রাণপণ লড়াই করে বিশ্বকে মুক্ত করেছিল মানবসভ্যতার জঘন্যতম শত্রু হিটলারের ফ্যাসিস্ট বাহিনীর হাত থেকে। গোটা দুনিয়া জুড়ে দেশপ্রেম ও বীরত্বের প্রতীকে পরিণত হয়েছিল সোভিয়েত সেনাবাহিনী ‘লালফৌজ’। সেই ঐতিহাসিক অসমসাহসী লড়াইয়ে ব্যক্তিগত মুনাফার কোনও ভাবনাও ছিল না। ছিল বর্বর ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করে সভ্যতা রক্ষার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা। আজ পচা-গলা অবক্ষয়িত সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ায় লালফৌজের জায়গা দখল করেছে ওয়াগনার সেনা কোম্পানি। আস্ফালন করছে মুনাফা-লুটেরা প্রিগোঝিনরা, সমাজতন্ত্র ভেঙে দিয়ে দেশের সম্পদের দখল নিয়ে ধনকুবের বনে যাওয়া পুতিনরা।

মণিপুর ঃ দেশ জুড়ে প্রতিবাদ দিবস

আমেদাবাদ, গুজরাট

গুনা, মধ্যপ্রদেশ

রাজারহাট, পশ্চিমবঙ্গ

যন্তরমন্তর, দিল্লি

আগরতলা, ত্রিপুরা

জৌনপুর, উত্তরপ্রদেশ

বাঙ্গালোর, কর্ণাটক

পশ্চিম মেদিনীপুর

কেন্দ্র ও রাজ্যের বিজেপি সরকারের ষড়যন্ত্রে প্রায় দু'মাস ধরে মেইতেই ও কুকি উপজাতির মানুষের মধ্যে সংঘর্ষে মণিপুর রাজ্যে আগুন জ্বলছে। ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে শতাধিক মানুষের, বাস্তুচ্যুত হয়েছেন কয়েক হাজার মানুষ। চলছে অগ্নিসংযোগ ও লুঠতরাজ।

এই সংঘর্ষে কেন্দ্র ও রাজ্যের বিজেপি সরকারের মদতদাতার ভূমিকার তীব্র নিন্দা করে এসইউসিআই(সি)-র পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, অবিলম্বে সরকারকে এই পরিস্থিতি দমন করে মানুষের মূল্যবান জীবন রক্ষায় ব্যবস্থা নিতে হবে। মণিপুরের সাধারণ মানুষের কাছেও দল নিজেদের মধ্যে ঐক্য শক্তিশালী করার ও বিচ্ছিন্নতাবাদী-জাতিবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলিকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার আহ্বান জানিয়েছে।

মণিপুরের এই ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টির পিছনে বিজেপি সরকারের ষড়যন্ত্রমূলক ঘৃণ্য ভূমিকার বিরুদ্ধে এসইউসিআই(সি) -র আহ্বানে ৩০ জুন দেশ জুড়ে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়।

ত্রিপুরা ঃ এ দিন দলের রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির উদ্যোগে রাজধানী আগরতলার বটতলায় প্রতিবাদ সভা হয়। বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক অরুণ ভৌমিক।

কর্ণাটক ঃ দলের বাঙ্গালোর জেলা কমিটির উদ্যোগে ফ্রিডম পার্কে এ দিন প্রতিবাদ সভা হয়। বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক এম এন শ্রীরাম। সভাপতিত্ব করেন জেলা কমিটির সদস্য জয়ান্না।

উত্তরপ্রদেশ ঃ প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে দলের জৌনপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বদলাপুরে মহকুমাশাসক দফতরের সামনে ধরনা আয়োজিত হয়। জৌনপুরে দলীয় দফতর থেকে শুরু হয়ে একটি মিছিল মহকুমাশাসক দফতরে পৌঁছায়। সেখান থেকে রাষ্ট্রপতির উদ্দেশে তিন দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি উপজেলাশাসকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। দাবিগুলি ছিল, মণিপুরের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকারকে দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে। সেখানকার সাধারণ মানুষের জীবনের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে সরকারকে এবং যাঁরা সংঘর্ষের শিকার ও বাস্তুচ্যুত হয়েছেন, তাঁদের জন্য পুনর্বাসন সহ উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দলের পূর্ব উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক রবিশঙ্কর মৌর্য সহ অশোক কুমার খরবার, ইন্দু কুমার শুক্ল, রাজেন্দ্র প্রসাদ তিওয়ারি প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন জয়প্রকাশ পাণ্ডেয়।

গুজরাট ঃ ৩০ জুন এসইউসিআই(সি) সহ অন্যান্য বামদলগুলি আহমেদাবাদের লাল দরওয়াজায় বিক্ষোভ দেখায়। মণিপুরের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যের বিজেপি সরকারের পদত্যাগ দাবি করেন তাঁরা। মণিপুরের দুর্গত জনসাধারণের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে তাঁরা দাবি করেন অবিলম্বে সেখানে পুলিশ ও মিলিটারির বাড়াবাড়ি বন্ধ করতে হবে।

মধ্যপ্রদেশ ঃ গুনা, গোয়ালিয়র সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় দলের উদ্যোগে ৩০ জুন প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ ঃ ৩০ জুন সারা দেশের মতো পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত জেলায় প্রতিবাদ দিবস পালন করল এসইউসিআই(সি)। মেদিনীপুর শহরে প্রতিবাদ মিছিল সহ জেলা প্রশাসনিক দপ্তরের সামনে প্রতিবাদ সভা সংগঠিত হয়। কলকাতা সহ রাজ্যের সর্বত্র পথসভা, বিক্ষোভ ইত্যাদি হয়।

পুরুলিয়া

অঙ্গনওয়াড়ি নেত্রী গ্রেফতার
প্রতিবাদ এআইইউটিইউসি-র

উত্তরপ্রদেশে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন চালাচ্ছেন। বার বার প্রতিশ্রুতি দিলেও তাঁদের দুর্দশা দূর করার কোনও রকম ব্যবস্থা নিচ্ছে না সরকার। কর্মী ও সহায়িকারা সরকারি উদাসীনতার বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্রতর করলে তাঁদের উপর জুলুম চালাচ্ছে সরকার। সম্প্রতি সেখানে 'অঙ্গনওয়াড়ি কার্যকর্ত্রী এবং সহায়িকা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন'-এর রাজ্য সহসভানেত্রী এবং সংগঠনের মইনপুরী জেলা সভানেত্রী সরিতা শাক্যকে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতার করে তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ। এআইইউটিইউসি-র উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক বলেন্দ্র কাটিয়ার এর প্রতিবাদ জানিয়ে ১ জুলাই এক বিবৃতিতে দাবি করেছেন, অবিলম্বে সরিতা শাক্যের বিরুদ্ধে করা এফআইআর বাতিল করতে হবে এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের সমস্ত দাবি পূরণ করতে হবে।

রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের ফাঁস

আরও শক্ত করতে চায় বিজেপি সরকার

ব্রিটিশ সরকার ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমন করতে যে রাষ্ট্রদোহ আইন তৈরি করেছিল, স্বাধীনতার ৭৫ বছর ধরে তা বহাল তবিয়তে সরকার বিরোধী প্রতিবাদকে দমন করতে কাজে লাগিয়েছে শাসকরা। কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার সেই আইনটিকে আরও কঠোর করতে চলেছে।

২০২২ সালে ১১ মে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এন ভি রামানার নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বেঞ্চ রাষ্ট্রদ্রোহ আইন তথা ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-এ ধারাটির উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে এই আইনটি পর্যালোচনার নির্দেশ দেয়। পর্যালোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই ধারায় আর কোনও মামলা নথিভুক্ত হওয়া উচিত নয় বলে জানায়। এমনকি যাদের বিরুদ্ধে এই মামলা হয়েছে তারাও জামিনের আবেদন করতে পারবে বলে জানায়।

সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশের এক বছর পর আইনটি পর্যালোচনা করে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার গঠিত আইন কমিশন ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-এ ধারা বহাল রাখারই প্রস্তাব দিয়েছে। কর্ণাটক হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ঋতুরাজ অবস্তির নেতৃত্বাধীন কমিশন 'রাষ্ট্রদ্রোহের ক্ষেত্রে আইনের ব্যবহার'— এই বিষয়ের উপর যে রিপোর্ট কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়ালের কাছে জমা দিয়েছেন, তাতে আইনে কিছু সংশোধনীও চাওয়া হয়েছে। যেমন সরকার বিরোধী বক্তব্যে হিংসা উদ্রেকের 'প্রবণতা' দেখা গেলেই তাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলা যেতে পারে, হিংসাত্মক ঘটনা যে ঘটেছে তার প্রমাণের দরকার নেই। এতদিন হিংসাত্মক ঘটনা ঘটানোর প্রমাণেই একমাত্র শাস্তি হতে দেখা যেত, এখন শাস্তির জন্য হিংসাত্মক ঘটনার প্রবণতা বা ইচ্ছাই যথেষ্ট বিবেচিত হবে। কিন্তু প্রবণতার মতো একটা বিমূর্ত বিষয় মাপা হবে কী করে? এ ছাড়াও কমিশন কারাদণ্ডের মেয়াদ বাড়াতে চায়, তিন বছর থেকে বাড়িয়ে অন্তত সাত বছর। অর্থাৎ আইনটি আরও কঠোর করতে চায় কমিশন।

রাষ্ট্রদ্রোহিতা নিয়ে গত কয়েক বছরে গণপরিসরে এবং এই আইনটি নিয়ে আদালতে যা কিছু বিতর্ক হয়েছে, যে সব সংশয় ও আশঙ্কা সামনে এসেছে আইন কমিশন তার কোনও কিছুকেই আমল দেয়নি। এমনকি, আইন কমিশনের রিপোর্ট সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণেরও বিপরীত। সম্প্রতি একটি মালয়ালাম চ্যানেলের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়ার নির্দেশ (৫ এপ্রিল ২০২৩) দিতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় বলেন, সরকারের নিন্দা করা মানেই দেশদ্রোহিতা নয়। সরকারের নীতির সমালোচনা করলেই প্রতিষ্ঠানবিরোধী বলা যাবে না। জনগণের অধিকারকে অস্বীকার করে নিরাপত্তার প্রসঙ্গ তোলা ঠিক না।

অথচ ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-এ ধারাটিতে বলা হয়েছে, লিখিত বা মৌখিক কোনও কথায় বা বাক্যে বা অঙ্গভঙ্গিতে বা অন্য কোনও ভাবে যদি এমন কোনও কিছু বোঝানো হয় যার দ্বারা ভারতে আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে কোনও অবমাননা বা হিংসা ছড়ানো হতে পারে, তা হলে সেই ব্যক্তির শাস্তি হবে। শাস্তিস্বরূপ সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে। এই ধারাটি কি গণতন্ত্রের সঙ্গে মানানসই? সরকার কি সমালোচনার ঊর্ধ্বে? গণতন্ত্রের মূল কথাই তো বাকস্বাধীনতা।

রাজতন্ত্রের যুগে রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি মনে করা হত। রাজার বিরুদ্ধে বলা মানেই ছিল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বলা। ফলে রাজদ্রোহের শাস্তি ছিল মত্যুদণ্ড। এর বিরুদ্ধতা করে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়েই এসেছে গণতান্ত্রিক শাসন, যেখানে বিরুদ্ধতার স্বরকে স্বীকৃতি দেওয়া গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত। নরেন্দ্র মোদি ও তার সরকারের আচরণে কোথাও তার ছিটেফোঁটা আছে কি? তিনি আমেরিকায় গিয়ে ভারতকে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ বলে দাবি করে এলেন। আর এ দিকে বাকস্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে রাষ্ট্রদ্রোহ আইন কঠোর করতে উঠেপড়ে লেগেছেন।

১৮৭০ সালে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকার 'সিডিশন' বা রাজদ্রোহ আইন প্রণয়ন করে। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ, ১৮৫৯ এর নীলবিদ্রোহ এবং ১৮৬০ এর ওয়াহাবি আন্দোলন— ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর একটার পর একটা বিদ্রোহে আতঙ্কিত ব্রিটিশ গণবিক্ষোভ দমন করতে এই আইন আনে। স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ সালে সংবিধান থেকে 'সিডিশন' শব্দটি বাদ দেওয়া হয় এবং সংবিধানের ১৯(১)-এ আর্টিকলে বাক-স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কিন্তু দণ্ডবিধির ১২৪-এ ধারাকে সযত্নে রেখে দেওয়া হয়। ১৯৬২ সালে কেদারনাথ সিং বনাম বিহার রাজ্য মামলায় সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ এই আইনটিকে বহাল রাখে। যদিও রায়ে বলা হয়, নিছক সরকারের সমালোচনা কখনও রাষ্ট্রদ্রোহ হিসাবে বিবেচিত হবে না। অথচ ১৯৭৩ সালেই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার ১২৪-এ ধারা বা রাষ্ট্রদ্রোহ আইনটি প্রয়োগ করে বিনা ওয়ারেন্টে বিরোধীদের গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা পুলিশের হাতে তুলে দেয়। তখন থেকে কংগ্রেস সরকার যতদিন কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত ছিল, বিচ্ছিন্নতাবাদ, উগ্রপন্থা প্রভৃতি দমনের অজুহাতে বহু ব্যক্তিকে এই আইনে গ্রেপ্তার করেছে। এই কংগ্রেসকেই এখন গণতান্ত্রিক শক্তি বলে জড়িয়ে ধরেছেন সিপিএম নেতারা।

নরেন্দ্র মোদি সরকারের আমলে (২০১৫-২০২০) ৩৫৬টি রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায় ৫৪৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। যদিও আজ অবধি মাত্র ১২ জনকে দোষী সাব্যস্ত করা গেছে। এমনকি ১৪৯ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করা হয়েছে শুধুমাত্র নরেন্দ্র মোদির সমালোচনা করার জন্য। ১৪৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সমালোচনা করার জন্য। রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের যথেচ্ছ ব্যবহার এমনই বাড়াবাড়ির স্তরে পৌঁছেছে, যাতে মনে হবে বিজেপি দলটিই বুঝিরাষ্ট্র আর এই দলের নেতারা সব রাষ্ট্রের এক একটি স্তম্ভ। আর দেশের নাগরিকরা সব বিজেপি নেতাদের প্রজা। নেতাদের অপকর্মের বিরোধিতাই রাজদ্রোহ।

রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে দেখা গেছে, শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ মামলাই ধোপে টেকেনি, বাতিল হয়ে গেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে বিচারের প্রক্রিয়াটাই শাস্তি হয়ে উঠেছে। কিছুদিন আগে, পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচ জেতায় আনন্দ প্রকাশের অপরাধে তিনজন কাশ্মীরি যুবকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা হয়। তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ৬ মাস বিচার চলার পর তারা বেকসুর মুক্তি পায়। বিচার শেষে আইনের চোখে অপরাধী না হলেও, ছ'মাস তাদের জেল খাটতে হয়।

২০১৮ সালে মণিপুরের সাংবাদিক ওয়াংখেম সমাজমাধ্যমে নরেন্দ্র মোদি, আরএসএস এবং রাজ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সমালোচনা করেছিলেন বলে মণিপুর রাজ্যের বিজেপি সরকার তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহ আইনে গ্রেপ্তার করে। একই ভাবে প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সমালোচনা করে উত্তরপ্রদেশে গ্রেপ্তার হয়েছেন কংগ্রেস নেতা অজয় রাই এবং এমনকি উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন রাজ্যপাল আজিজ কুরেশি। ২০২০-র অক্টোবরে উত্তরপ্রদেশের হাথরসে গণধর্ষণে মৃত তরুণীর গ্রামের দিকে যাওয়ার সময় সাংবাদিক সিদ্দিক কাপ্পান এবং তার কয়েকজন সহযোগীকে গ্রেপ্তার করে, এই সিডিশন সহ বেশ কিছু দমনমূলক আইনের ধারা প্রয়োগ করে কার্যত বিনা বিচারে আটকে রেখেছিল বিজেপি সরকার। যে বিজেপি নিজেই একের পর এক দাঙ্গা লাগিয়ে বেড়াচ্ছে সেই দিল্লি দাঙ্গায় প্ররোচনার অভিযোগে এই আইনে দীর্ঘদিন বন্দি করে রেখেছে জেএনইউ এর প্রতিবাদী ছাত্র উমর খলিদকে।

কংগ্রেস সরকারও পিছিয়ে নেই। ছত্তিশগড়ের কংগ্রেস সরকার এক প্রাক্তন পুলিশ অফিসারকে রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার করেছে, কারণ তিনি সরকারের বিরুদ্ধে 'উত্তেজক' লেখা লিখেছেন। অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্য যে মুম্বাইয়ে রবি রানা ও নবনীত রানা 'রাষ্ট্রদ্রোহ' করে গ্রেপ্তার হয়েছেন কেন না তাঁরা মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে হনুমান চাল্লিশা গাইবার হুমকি দিয়েছিলেন। আবার তামিলনাড়ুতে 'তামিল দিবস' উদযাপন অনুষ্ঠানে একটি 'তামিল পতাকা' উত্তোলন করার জন্য রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সীমান নামক এক তামিল নেতাকে। ২০১৯-এ পুলওয়ামায় সেনা কনভয়ে বিস্ফোরণের ঘটনার পর সোসাল মিডিয়ায় যেসব তর্কবিতর্ক হয়েছিল তার মধ্যে ২৬ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ করা হয়েছে কারণ, অভিযোগকারীদের মতে অভিযুক্তরা 'পাকিস্তানের পক্ষে' এবং 'দেশবিরোধী' মতামত প্রকাশ করেছেন। সিএএ বিরোধী আন্দোলনকারীদের মধ্যে ৩৭৫৪ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ করা হয়েছে। ২০১৮ তে ঝাড়খণ্ডে আদিবাসীরা নিজেদের জমিজায়গা রক্ষার দাবিতে পাথালগড়ি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধেও এই আইন ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল।

পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ এই অস্ত্র প্রয়োগ করত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে। বালগঙ্গাধর তিলক, মহাত্মা গান্ধী, ভগৎ সিং সহ অসংখ্য নেতা কর্মীর বিরুদ্ধে এই আইন প্রয়োগ করা হয়েছিল।

সাতের পাতায় দেখুন

এলাহাবাদে আলোচনা সভা

উত্তরপ্রদেশে গভর্নমেন্ট প্রেসের শ্রম হিতকারী কেন্দ্রে আইনজীবদের সংগঠন অধিবক্তা মঞ্চ এলাহাবাদের পক্ষ থেকে ২৪ জুন একটি আলোচনা সভা হয়। বিষয় ছিল, 'ধর্মের স্বাধীনতা ও সংবিধান'। প্রধান বক্তা ছিলেন মুম্বইয়ের সিএসএসএস-এর নির্দেশক অ্যাডভোকেট ইরফান ইঞ্জিনিয়ার। সভাপতিত্ব করেন কমলকৃষ্ণ রায়। সভা পরিচালনা করেন মঞ্চের সংযোজক রাজবেন্দ্র সিংহ।

রাষ্ট্রদ্রোহ আইন

ছয়ের পাতার পর

ঔপনিবেশিকতার মৌলিক চরিত্র নিপীড়নের মাধ্যমে শাসন। রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের প্রতিটি ছত্রে এই চরিত্রের প্রকাশ। সরকারের প্রতি অপ্রীতি তৈরি হতে পারে, এমন কথা বলা বা লেখাই আইনত রাষ্ট্রদ্রোহিতা। সে সময় নজরুলের কবিতা, শরৎচন্দ্রের পথের দাবী উপন্যাস, প্রেমচন্দের গল্প, চারণ কবি মুকুন্দদাসের গানের মতো যে কোনো রচনা, সঙ্গীত, সাধারণ সভা-সমিতির বক্তব্য সমস্ত কিছুকেই 'সিডিশাস' ছাপ মেরে নিষিদ্ধ করে দেওয়া এবং সংশ্লিষ্ট লেখক, শিল্পী, বক্তাদের গ্রেফতার করা ছিল ব্রিটিশ শাসনকালের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা।

শরৎচন্দ্র তাঁর অনবদ্য শৈলীতে এই সিডিশন আইনকে তীব্র কষাঘাত করে লিখেছিলেন — 'আজ এই দুর্ভাগা রাজ্যে সত্য বলিবার জো নাই, সত্য লিখিবার পথ নাই — তাহা সিডিশান। অথচ দেখিতে পাই, বড়লাট হইতে শুরু করিয়া কনস্টেবল পর্যন্ত সবাই বলিতেছেন — সত্যকে তাঁহারা বাধা দেন না, ন্যায়-সঙ্গত সমালোচনা — এমনকি, তীব্র ও কটু হইলেও নিষেধ করেন না। তবে বক্তৃতা বা লেখা এমন হওয়া চাই, যাহাতে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে লোকের ক্ষোভ না জন্মায়, ক্রোধের উদয় না হয়। চিত্তের কোনও প্রকার চাঞ্চল্যের লক্ষণ না দেখা দেয় — এমনি। অর্থাৎ, অত্যাচার-অবিচারের কাহিনী এমন করিয়া বলা চাই, যাহাতে প্রজাপুঞ্জের চিত্ত আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠে, অন্যায়ের বর্ণনায় প্রেমে বিগলিত হইয়া পড়ে এবং দেশের দুঃখ দৈন্যের ঘটনা পড়িয়া দেহ-মন যেন তাহাদের একেবারে স্নিগ্ধ হইয়া যায়। ঠিক এমনটি না ঘটিলেই তাহা রাজবিদ্রোহ।' সাল-তারিখ না জানলে মনে হয় একেবারে আজকের ভারতে বসে লেখা।

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে, এমন একটি স্বৈরাচারী আইন স্বাধীন ভারতে থেকে গেল কী করে? ভারত রাষ্ট্রের জন্মের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ব্রিটিশ শাসিত ঔপনিবেশিক ভারত রাষ্ট্রটি তৈরিই হয়েছিল ভারতীয় সম্পদ লুঠ করার এবং তার বিরুদ্ধে যে কোনও প্রতিবাদ দমন করার যন্ত্র হিসাবেই। আপসের পথে ব্রিটিশদের হাত থেকে রাষ্ট্রযন্ত্রটি দেশীয় পুঁজিপতিদের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে মাত্র। তাই ব্রিটিশ চলে গেলেও স্বাধীন ভারতে পুঁজিপতি শ্রেণির সেবক সব দলই ক্ষমতাসীন থাকার জন্য এই ব্রিটিশের তৈরি কুৎসিত কালা আইনটিকে অক্ষত রেখেই তার সুবিধা নিয়ে চলেছে।

স্বাধীনতার ৭৫ বছর পার করে এসেছি আমরা। ব্রিটিশ চলে গেছে অনেক দিন। স্বাধীন ভারতে সরকার পাল্টেছে অনেক বার। কিন্তু 'আইনের জোরে সরকারের প্রতি ভালোবাসা' তৈরি করার প্রয়াস পাল্টায়নি। তাই বর্তমান আইন কমিশন তাদের সুপারিশে জানিয়েছে, উপনিবেশিক যুগের আইন বলেই রাষ্ট্রদ্রোহ আইন বাতিল করার যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। দেশের সংহতির স্বার্থে ও মৌলবাদ মোকাবিলা করতে এই আইনের প্রয়োজন আছে। যেন শাসক ব্রিটিশ সেদিন দেশের সংহতির স্বার্থে ও মৌলবাদ মোকাবিলা করতেই এই আইন প্রণয়ন করেছিল! বিশ্বের বহু দেশ চরম দমনমূলক এই আইন বাতিল করেছে। ২০০৯ সালে ব্রিটেনেও রাষ্ট্রদ্রোহ আইন বাতিল হয়েছে। অথচ পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ শাসকের নিপীড়নের ধারাকেই, নানা ছলচাতুরি ও কুযুক্তির আড়ালে বহাল রাখতে চাইছে বর্তমান বিজেপি সরকার। বর্তমান ভারত রাষ্ট্র তথা ভারত সরকার ব্রিটিশ শাসনের উত্তরাধিকারই বহন করে চলেছে।

লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি, সরকার কোথায়

একের পাতার পর

বছরে শুধু তিন লাখের বেশি শিশুই মারা যাচ্ছে, সেই সময় প্রধানমন্ত্রী আমেরিকায় গিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাথে কোলাকুলিতে ব্যস্ত। এই সময়েই ভারত বিশ্বের ১২১টি দেশের মধ্যে ১০৭তম স্থান পেয়ে ক্ষুধা তালিকাকে 'অলঙ্কৃত' করছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তার সরকার মূল্যবৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণে রেখেছে, বেলাগাম হতে দেয়নি। কেমন নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন তারা? দেশে গত পাঁচ বছরে চালের দাম বৃদ্ধির হার ৩২.২ শতাংশ, গমের দামবৃদ্ধির হার ৩৬.২ শতাংশ, ডালের ক্ষেত্রে বেড়েছে ৮৪.৮ শতাংশ (দ্য হিন্দু-২৯ জুন,২০২৩)। অন্যান্য সব খাদ্যদ্রব্য, অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের দামও পাল্লা দিয়ে বেড়েছে।

স্বভাবতই সরকারের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ মানুষ। সমালোচনার সামনে পড়ে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর বলেছেন, মোদিজি গোটা ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকাকে খাদ্যের জোগান দিতে পারবেন। খুব ভাল কথা জয়শঙ্করজি, কিন্তু তার আগে প্রধানমন্ত্রীকে বলুন, যাতে তিনি খাদ্যদ্রব্যের দাম কমানোর জন্য ব্যবস্থা নিয়ে দেশের মানুষের জন্য দু'বেলা পেটভরা খাবার জোটানোর ব্যবস্থা করেন।

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রক ২৩ জুন ঘোষণা করেছে, দাম কমাতে সরকার খোলাবাজারে ৫ লক্ষ টন চাল ও ৪ লক্ষ টন গম ছাড়বে। কিন্তু সেগুলি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাবে তো? তার জন্য সরকার কি উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছে? না হলে তো তা কালোবাজারিদের পেটই আরও মোটা করবে। সরকার সাধারণ মানুষের দুরবস্থার কথা ভাবলে তো তাদের হাতেই এই চাল-গম তুলে দিতে পারত। কেন্দ্রীয় ভাবে সারা দেশে যে রেশন ব্যবস্থা রয়েছে, তার মাধ্যমে বিনামূল্যে পৌঁছে দিতে পারত গ্রাহকদের কাছে। সেই ব্যবস্থাকে ক্রমাগত দুর্বল করে দিয়ে খোলাবাজারে এগুলি ছাড়া মানে তো গরিবের অন্নকে খাদ্যদ্রব্যের একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের হাতে মুনাফার পণ্য করে দেওয়া। কারণ, ব্যবসায়ীরা সরকারি গুদামের চাল-গম নিজেদের হেফাজতে মজুত করে যে কোনও দামে বাজারে বিক্রি করার ছাড়পত্র পাবে। চড়া দাম দিয়ে তা কিনতে হবে সাধারণ মানুষকে।

খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়ে কখন? প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে বা কোনও কারণে উৎপাদন কম হলে কিংবা উৎপাদিত দ্রব্য সাধারণ মানুষের হাত পর্যন্ত না এসে বড় ব্যবসায়ীদের হাতে মজুত হলে। সরকার যতই খারাপ আবহাওয়ার দোহাই দিক, এবারে বড়সড় কোনও বিপর্যয় ঘটেনি। চাল-গমের উৎপাদনও বেশ ভালো। চাল উৎপাদনে বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয় ভারতে ২০২২-২৩-এ চাল উৎপন্ন হয়েছে ১,৩০৮.৩৭ লক্ষ টন, গত বছরের থেকে ১৩.৬৫ লক্ষ টন বেশি। আবার ভারতের মধ্যে ধান উৎপাদনে সর্বোচ্চ স্থান পশ্চিমবঙ্গের। দেশে গম উৎপাদন হয়েছে ১,১২৭.৪ লক্ষ টন, গত বছরের থেকে ৫০ লক্ষ টন বেশি। এখন এফসিআই গুদামে চাল রয়েছে ন্যূনতম প্রয়োজনের অতিরিক্ত ২৯২ লক্ষ টন, গম ৮৭ লক্ষ টন। অথচ দেশে নাকি খাদ্যসম্পদের অভাব! দেশের মানুষের প্রয়োজন মেটানোর মতো যথেষ্ট শাক-সবজিও উৎপাদিত হচ্ছে।

উৎপাদনে এত প্রাচুর্য সত্ত্বেও ব্যাপক হারে মূল্যবৃদ্ধি হয়ে চলেছে কেন? বাস্তবে খাদ্যদ্রব্যের বাজারে সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। বহুজাতিক পুঁজিপতিরাই এখন মজুতদারি-কালোবাজারি করে। এরাই খাদ্যদ্রব্যের গোটা বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করছে। কোন ফসল ফললে বেশি লাভ হবে, তাতে কোন কোম্পানির বীজ-সার-কীটনাশক ব্যবহৃত হবে, সেচ থেকে ফসল তোলা এবং তা মজুত, বিক্রির বন্দোবস্ত— সব কিছু এদের নিয়ন্ত্রণে। দীর্ঘদিন থেকেই খাদ্য উৎপাদন, মজুত এবং পরিবহনের মতো ক্ষেত্রগুলির দখল নিয়েছে বহুজাতিক কোম্পানিগুলি। তাদের পিছনে সব রকমের মদত নিয়ে দাঁড়িয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। এ ক্ষেত্রে আদানিরাই সবার থেকে এগিয়ে। ২০০৫-এর 'আদানি এগ্রি লজিস্টিক লিমিটেড' থেকে সাম্রাজ্য বিস্তার করে ২০১৮-১৯-এ আদানিরা তৈরি করেছে 'আদানি পোর্ট অ্যান্ড স্পেশাল ইকনমিক জোন'। অর্থাৎ শুধু শস্য মজুতদারি করেই লুটেরাদের পেট ভরছে না, তারা খাদ্যপরিবহন এবং চালানের ব্যবসারও দখল নেওয়ার সুবন্দোবস্ত করে ফেলেছে। এমনকি হিমাচলপ্রদেশে আপেল উৎপাদনের একচেটিয়া ব্যবসাতেও ঢুকে পড়েছে আদানিরা। অন্যান্য বহুজাতিক কোম্পানিগুলিও পিছিয়ে নেই। সরকার-পুঁজিপতি সম্পর্ক আজ এতটাই নগ্ন যে, এই লুটেরাদের স্বার্থে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কোনও নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে এমনকি আইন বদলে দিয়ে দেশের অন্যান্য সম্পদের মতো তাদের হাতে খাদ্যসম্পদও তুলে দিতে দ্বিধা করছে না। এই কারণেই তারা নিয়ে এসেছিল কৃষক স্বার্থবিরোধী কৃষিআইন, দেশব্যাপী কৃষকদের প্রতিরোধে যা ভেস্তে গিয়েছে।

মুনাফার স্বার্থে খাদ্যপণ্যের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে এই বহুজাতিক পুঁজিপতিরা। একদিকে হিমঘরে শস্য মজুত রেখে সংকটের সময়ে তা বিপুল দামে দেশীয় বাজারে বিক্রি করে, অন্য দিকে বিদেশে রপ্তানি করে বিপুল মুনাফা লোটে। কে নেই এই লুঠে? আদানি, আম্বানি, বালাজি, পতঞ্জলি এমন বহু কোম্পানিই রয়েছে। এমনকি সরকারি সংস্থা এফসিআই-এর মজুত ভাণ্ডার হিসাবে লক্ষ লক্ষ টন শস্য রেখে সেখান থেকে ইচ্ছেমতো ভাড়া আদায় করে এই কোম্পানিগুলি। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিহারে এরকম বহু মজুত ভাণ্ডার রয়েছে আদানি সহ পুঁজিপতি গোষ্ঠীগুলির। সরকার তাদের মুনাফা লোটার গ্যারান্টার হিসেবে কাজ করে। তার বিনিময়ে এই ব্যবসায়ীরা ভোটের সময় কিংবা অন্যান্য সময়ে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলির তহবিলে মোটা টাকা ভেট দেয়। তাদের সরকারে বসার, টিকে থাকার ব্যবস্থা করে। সরকার বদলালে ক্ষমতাসীন দলের সাথে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের এই নতুন আঁতাত গড়ে ওঠে। এই নীতিহীন লেনদেনে বলি হয় সাধারণ মানুষের স্বার্থ। তাই সরকারি গুদামে লক্ষ লক্ষ টন চাল-গম পচে গেলেও সাধারণ মানুষের মুখে তা পৌঁছয় না। শুধু ভোটের আগে মানুষের সমর্থন পেতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি কখনও 'প্রধানমন্ত্রী অন্ন যোজনা', কখনও 'খাদ্য সুরক্ষা যোজনা', কখনও 'খাদ্যসাথী'র মতো প্রকল্পের মাধ্যমে কিছু চাল-গম মানুষের হাতে গুঁজে দিয়ে তাদের ভোট প্রার্থনা করে।

রাজ্যের তৃণমূল সরকারও মূল্যবৃদ্ধিতে মানুষের এই জেরবার অবস্থায় হাত গুটিয়ে রয়েছে। বাজারে যখন আগুন জ্বলছে, হঠাৎ তখন তড়িঘড়ি বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি কি মানুষের এই দুরবস্থা জানতেন না? সরকারের টাস্ক ফোর্স, এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ সারা বছর ধরে কী করে? তারা মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী মজুতদার-কালোবাজারিদের ধরতে পারে না? এখন মূল্যবৃদ্ধিতে মানুষের ক্ষোভের আঁচ টের পেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে স্বরাষ্ট্রসচিব, কলকাতার পুলিশ কমিশনার, এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ, কৃষি বিপণন-সহ বিভিন্ন দফতরের সচিব এবং ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে টাস্ক ফোর্সের বৈঠক করছেন মুখ্যসচিব। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে বেশ একটা 'যুদ্ধ যুদ্ধ' ভাব! তাঁরা 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে' নাকি 'সুফল বাংলা'র স্টল থেকে কলকাতা এবং সংলগ্ন এলাকায় বাজারের থেকে গড়ে প্রতি কেজি ৫-১০ টাকা কম দরে সবজি বিক্রি করবে। প্রশ্ন হল, সুফল বাংলার স্টল থেকে কত জন কিনতে পারবেন? আর সবজির দাম যেখানে ৭০-৮০-১০০ টাকা, সেখানে ৫ বা ১০ টাকা কমে কতটা উপকৃত হবেন সাধারণ মানুষ? শুধু 'প্রকৃতির মার'-এর দোহাই দিয়ে তারা আর কতদিন সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝাবেন?

সাধারণ মানুষের প্রতি ন্যূনতম দায়িত্ববোধ থাকলে ক্ষমতাসীন দলগুলি এটা করতে পারত না। আসলে কেন্দ্রে-রাজ্যে আসীন ক্ষমতাসীন দলগুলি যতই গরিব দরদের কথা বলুক, তারা আসলে পুঁজিপতি শ্রেণিরই স্বার্থ দেখার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। পুঁজিবাদী এই সমাজের অন্তিমদশায় তা আরও নগ্ন হয়ে উঠেছে। তাই মূল্যবৃদ্ধির আগুনে খাক হয়ে সাধারণ মানুষ এর থেকে নিস্তার চাইলেও পাচ্ছে না। তা পেতে হলে আজ দরকার মূল্যবৃদ্ধির আগুনে জ্বলতে থাকা মানুষের সচেতন ঐক্য। সেই ঐক্য যেমন খাদ্যদ্রব্যের কালোবাজারির বিরুদ্ধে সরব হবে, তেমনই যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের এই অবাধ লুঠের ব্যবস্থা করে দেয় তার বিরুদ্ধেও আওয়াজ তুলবে।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

দিনে-রাতে আলাদা বিদ্যুৎ মাশুল

তীব্র বিরোধিতা অ্যাবেকার

ব্যবহারের সময় অনুযায়ী বিদ্যুতের মাসুল স্থির করার নতুন বিধি আনছে কেন্দ্রীয় সরকার। বিদ্যুৎ মন্ত্রক জানিয়েছে, দিনের ২৪ ঘন্টায় চাহিদা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে আলাদা আলাদা বিদ্যুৎ মাসুল। যেমন, রাতে বিদ্যুতের চাহিদা যখন বেশি, তখন মাসুল হবে সাধারণ হারের তুলনায় বেশি। দিনে চাহিদা কম বলে, মাসুল হবে কম। ২৬ জুন এক বিবৃতিতে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা)-এর সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস কেন্দ্রীয় সরকারের বিদ্যুৎ মন্ত্রক কর্তৃক স্মার্ট মিটারের সাথে 'টাইম অফ ডে' (টিওডি) সিস্টেমের মাধ্যমে গ্রাহকবিরোধী এই নতুন বিধির তীব্র বিরোধিতা করেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, এই বিধি সাধারণ বিদ্যুৎগ্রাহক স্বার্থবিরোধী ও একচেটিয়া বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ মুনাফা লুটের পরিপূরক। সেই উদ্দেশ্যেই গৃহস্থ গ্রাহকরা দিনের বেলা আট-দশ ঘন্টা যখন বাড়ির বাইরে থাকেন, তখন তাঁকে সাধারণ দামের ১০-২০ শতাংশ কম দামে বিদ্যুৎ দেওয়া হবে এবং রাতে যখন তাঁরা বিশ্রামের জন্য ঘরে থাকতে বাধ্য হবেন, তখন তাঁকে সাধারণ দামের ১০-২০ শতাংশ বেশি দাম দিতে হবে। যদিও সাধারণ দাম কোন সময়ের জন্য, সে সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। একই ভাবে বাণিজ্যিক গ্রাহকদের ক্ষেত্রে সন্ধ্যায় যখন প্রতিষ্ঠান আলোকিত করার প্রয়োজন বেশি, তখন তাঁদের বেশি দামে বিদ্যুৎ কিনতে হবে।

তিনি বলেন, বেশিরভাগ ক্ষুদ্রশিল্প দুই শিফটে চলে। এই বিধি চালু হলে দামী বিদ্যুতের কারণে বিকেলের শিফট বন্ধ রাখতে তারা বাধ্য হবে। পরিণামে একলাফে বেকারসংখ্যা বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে। দেখা যাচ্ছে, জনস্বার্থের তোয়াক্কা না করে মোট প্রয়োজনের তুলনায় কম বিদ্যুৎ উৎপাদন করে এবং প্রয়োজনের সময় বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে মালিকদের মুনাফা আরও বাড়ানোর আইনগত ব্যবস্থা করছে সরকার। বিদ্যুৎগ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকার পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে সমস্ত স্তরের সাধারণ বিদ্যুৎ গ্রাহকদের প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

বহরমপুরে স্টাডি ক্লাস

মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের ঋত্বিক সদনে ১৮ জুন অনুষ্ঠিত হল দলের জেলা স্টাডি ক্লাস। পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটবুরো সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষাল, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তরুণ মণ্ডল এবং রাজ্য কমিটির সদস্য ও জেলা সম্পাদক কমরেড সাধন রায়।

রাজ্যপালের উপাচার্য সংক্রান্ত ঘোষণা

প্রত্যাহারের দাবি এআইডিএসও-র

পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উপাচার্য নিয়োগ প্রসঙ্গে রাজ্যপাল সম্প্রতি কালিম্পং থেকে ঘোষণা করেছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্ররাই অন্তবর্তীকালীন উপাচার্য হতে পারবেন। এই ঘোষণায় উদ্বেগ প্রকাশ করে ১ জুলাই এআইডিএসও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় একটি বিবৃতিতে বলেন, স্থায়ী উপাচার্য না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রশাসনিক কাজ ঠিক সময়ে হচ্ছে না, মূল্যায়ন ও রেজাল্ট প্রদান সহ নানা বিষয়ে খুবই অবহেলা হচ্ছে। এই অবস্থায় প্রয়োজন স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করা। শুধু তাই নয়, উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে ইউজিসি-র গাইডলাইন অনুযায়ী কমপক্ষে ১০ বছরের অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। রাজ্যপালের ঘোষণায় সেই গাইডলাইন শুধু ভঙ্গ হবে তাই নয়, ছাত্র-উপাচার্যের অনভিজ্ঞতার কারণে শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং উৎকর্ষতার উন্নতিও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শিক্ষার পরিবেশও বিঘ্নিত হবে। উচ্চশিক্ষা আরও বেশি করে প্রহসনে পরিণত হবে। রাজ্যপালের এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানান তিনি।

'কোড অফ কন্ডাক্ট'-এর নামে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের চেষ্টা

বিক্ষোভ এআইডিএসও-র

নবজাগরণের প্রেরণায় ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষাপ্রেমী মনীষীদের উদ্যোগে প্রেসিডেন্সি কলেজ মুক্তচিন্তার পীঠস্থান ও আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে। এর সঙ্গে যুক্ত মনীষী ও শিক্ষাপ্রেমী মানুষের তালিকা দীর্ঘ, যাঁদের রক্তে ঘামে স্বপ্নে গড়ে উঠেছে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের একের পর এক শিক্ষাস্বার্থ বিরোধী নীতিগুলো কার্যকরী করতে করতে প্রেসিডেন্সির বর্তমান করুণ পরিণতি শিক্ষাপ্রেমী মানুষ লক্ষ না করে পারে না। শিক্ষার মানোন্নয়নের ন্যূনতম প্রচেষ্টা না থাকলেও প্রেসিডেন্সি কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষাকর্মীদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ ও ক্যাম্পাসের আভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক পরিসর সংকুচিত করতে স্বৈরাচারী 'কোড অফ কন্ডাক্ট' চালু করার কথা বলছে।

এর বিরুদ্ধে ২৬ জুন এআইডিএসও-র কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীরা কলেজ স্ট্রিটে মিছিল করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখান। সংগঠনের প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের পক্ষ থেকে ডিন অফ স্টুডেন্টকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

দাবি জানানো হয়, ১) প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০' কার্যকর করা চলবে না। ২) অগণতান্ত্রিক এবং স্বৈরতান্ত্রিক 'কোড অফ কন্ডাক্ট' সম্পূর্ণ বাতিল করতে হবে। ৩) ছাত্রছাত্রীদের রাজনৈতিক আন্দোলনের অধিকার এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে একই ছত্রে উল্লেখ করার জন্য কর্তৃপক্ষকে ভুল স্বীকার করতে হবে। ৪) ঐতিহ্যশালী প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার প্রত্যেক শিক্ষাপ্রেমী মানুষের জন্য খোলা রাখতে হবে। আন্দোলনের চাপে কর্তৃপক্ষ পরের দিন 'কোড অফ কন্ডাক্ট' প্রত্যাহার করার ঘোষণা করে।

কর্ণাটকে পানীয় জলের জন্যও টাকা!

প্রতিবাদ এস ইউ সি আই (সি)-র

কর্ণাটকে গত চার বছর ধরে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার যে জলজীবন মিশন প্রকল্প চালু করার চেষ্টা চালাচ্ছে, তাতে 'হর ঘর জল'-এর নামে গোটা রাজ্যের গ্রামগুলিতে প্রত্যেকটি পরিবারের জলের কলে মিটার বসানো হবে এবং জল সরবরাহের বিনিময়ে দরিদ্র মানুষের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হবে। ফলে দৈনন্দিন ব্যবহারের জলের জন্য জনসাধারণকে বিপুল টাকার বিল মেটাতে হবে।

এই প্রকল্পের তীব্র নিন্দা করে এসইউসিআই(সি)-র কর্ণাটক রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, স্বাধীনতার ৭৫ বছর পার হয়ে গেলেও সরকারগুলি আজও জলের মতো জীবনধারণের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থাটুকুও করতে পারেনি। একটি গণতান্ত্রিক দেশে জনসাধারণের কাছ থেকে যে কর সংগ্রহ করা হয়, তা দিয়েই জলের মতো জনসাধারণের বুনিয়াদি প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা করার কথা। তা না করে সরকারগুলি জলকেও পণ্যে পরিণত করছে। বিবৃতিতে বলা হয়, মূল্যবৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য-শিক্ষার বেসরকারিকরণের কারণে ইতিমধ্যেই জনজীবন বিপর্যস্ত। এর উপর জলে মিটার বসানো হলে তা একটি কঠিন আঘাত হিসাবে আসবে। সরকারের এই জনস্বার্থবিরোধী প্রকল্পের বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষকে একজোট হওয়ার ডাক দিয়ে দলের পক্ষ থেকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছে— অবিলম্বে জলজীবন প্রকল্প বাতিল করে জল সরবরাহের পুরনো ব্যবস্থাকে উন্নততর রূপে ফিরিয়ে আনতে হবে।

মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে এআইডিএসও বহরমপুর লোকাল কমিটির উদ্যোগে ২৮ জুন কৃষ্ণনাথ কলেজ ও বহরমপুর গার্লস কলেজ গেটে (ছবি) বুকস্টল হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com